চতুর্থ অধ্যায়

আশালতা সিংহের গল্পবিশ্বে : নারী প্রাধান্যের জগৎ

সাহিত্যের অঙ্গনে ছোটগল্প এক অন্যতম সংযোজন। স্বল্প পরিসরে গঠিত ছোটগল্পে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের নানারূপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এছাড়াও জীবনের নানাবিধ বাস্তব সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে ছোটগল্প আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তোলে। বাংলা ছোটগল্পচর্চায় আশালতা সিংহ অনস্বীকার্য কৃতিত্বের অধিকারিণী। আশালতার গল্পবিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারীর প্রাধান্যই নজরে পড়ে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সুবিধাভোগী কিছু পুরুষেরা আপন সুবিধার্থে নারীদের জন্য নির্ধারণ করে বিবিধ নিয়মনীতি। আর এই নিয়মনীতির নামে নারীদের ওপর চলতে থাকে নানা অত্যাচার। নারীদের প্রতি ঘটে চলা সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কলম ধরেছেন অনেকেই। আশালতা তাদেরই একজন। তিনি এবং তাঁর সহযোগী যোদ্ধাদের প্রতিবেদনে উঠে আসে 'মেয়েদের আক্ষেপ', 'রোষ', 'হতাশা', অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণে প্রতিপালিত হন। তথাপি সমাজে নারীর অবমাননা, নারী হৃদয়ের হাহাকার স্বর্ণকুমারীকে বিচলিত করে তোলে। 'আমি অন্তঃপুরের মেয়ে চিনবে না আমাকে', — রবীন্দ্রনাথ বিরচিত কবিতার নারীচরিত্রের মুখে যে অন্তঃপুরের কথা কর্ণগোচর হয় স্বর্ণকুমারীর লেখাতেও অন্তঃপুরের নারীর জীবন বৃত্তান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। সমাজে নারী অবমাননার দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে এঁকেছেন স্বর্ণকুমারী তাঁর 'যমুনা' গল্পে। যমুনা ছোট্টবেলা থেকেই লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে চলছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। কখনো পিতার মৃত্যুর পর আত্মীয় পুরুষদের কাছে, আবার কখনো স্বামীর কাছে। গল্পের শেষে যমুনাকে দেখা যায় শ্মশানে, গল্পের কথক তাকে বলে—

"যমুনা আমাদের বাড়ি চল্ না? যমুনা উত্তর করিল,
দিদি শ্মশানই আমার আপনার ঘর। এঘর আর ছাড়িব

না। ... আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতাম, একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কুটির দ্বারে আসতেই কতকগুলা শৃগাল-কুক্কুর আমার দিকে চাহিয়া একবার চিৎকার করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল। হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম— অভাগিণীর মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইতেছে।'[১]

পুরুষশাসিত সমাজে যমুনার কাছে একমাত্র বিশ্বাসস্থল হয়ে ওঠে শ্মশান। স্বর্ণকুমারী ধিক্কার জানান পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে। যমুনা বুঝতে পারে এখানে আর কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না। এছাড়া 'সন্ন্যাসিনী', 'কেন', 'লজ্জাবতী' প্রভৃতি আরও গল্পে নারীর দুঃখ, অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন স্বর্ণকুমারী বলিষ্ঠভাবে। স্বর্ণকুমারীর লেখনীতে নারীজীবন যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি গুরুত্ব পেয়েছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর লেখনীতেও। মুসলমান সমাজে পর্দার নামে নারীদেরকে অবরোধের মধ্যে দিন যাপন করতে হত। রোকেয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুসলিম নারীরা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল। পুরুষতন্ত্র ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের আড়ালে নারীর ওপর তাদের অধিকার বজায় রাখতে চায়। রোকেয়ার দেখেছিলেন হিন্দু কী মুসলমান উভয়ধর্মেই কোথাও 'মনুসংহিতা' বা কোথাও 'শরিয়তের' নামে চলছে নারীর ওপর নিরন্তর অত্যাচার। তাই তাঁর লিখিত 'সুলতানার স্বপ্নে' আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন—

"সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নেই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু তাহারা সমুদয় সুখ-

সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে আর সবলা অবলাকে অন্তঃপুররূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে।"

সুবিধাভোগী পুরুষসমাজের নির্মিত নিয়মনীতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত মেয়েদের রোকেয়া দেখেছিলেন, যাদের 'নিশ্চিত নিজস্ব আশ্রয়' নেই। তাই রোকেয়া লিখেছিলেন—

"গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটির নাই? প্রাণীজগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে।"[২]

রোকেয়ার কলমে ওঠে আসে সেই নিরাশ্রয়া, নির্যাতিতা, অপমানিতা মেয়েদের জীবনকাহিনি। রোকেয়া সারাজীবন ধরেই কুসংস্কার, কুশিক্ষা, অবরোধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখিকা অনুরূপাও একথা স্বীকার করে বলেছিলেন—

"আমি সাহিত্যকে সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করি সমাজকে আনন্দ দেওয়া এবং পথ নির্দেশ করাই তার প্রধানত কাজ বলে বিশ্বাস করি।"[৩]

তাই অনুরূপা দেবীর কলমেও নারীজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। অনুরূপাদেবীর নারীচরিত্ররা শিক্ষিত, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পারিবারিক কর্তব্যকে পালন করে চলেন, চরিত্রের দৃঢ়তায় অটল। তাঁর রচিত 'পরাজয়' ও 'দেবদাসী' গল্প দুটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। 'পরাজয়' গল্পে বাঙালী চিত্রকর বিভূতি দরিদ্র, মারাঠি ব্রাহ্মণ কন্যা

রেবার প্রেমে পড়ে। রেবা দরিদ্র, মারাঠি ব্রাহ্মণ কন্যা বলে হিন্দুসমাজের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে রেবাকে বিয়ে করতে চায়। বিভূতির অজান্তে একদিন তাঁর বন্ধু প্রমথ এসে রেবাকে বলে—

> *"কিন্তু তাতে ওর ভারি ক্ষতি হবে, ওর মা কাঁদবে,*
> *সকলে ওকে ত্যাগ করবে, নিন্দা করবে, — তবু*
> *তুমি ওকে বিয়ে করবে।"*[৪]

এখানে অনুরূপার লেখনীর কুশলতায় পরিস্ফুট হয় হিন্দুসমাজের মলিন রূপ। গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফলে রেবা 'তর্কযুদ্ধে' বিজয়ী হয়। সমাজের কদর্যতা ভেদ করে সে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। রেবার ব্যক্তিসত্তার জয় ঘোষিত হয়। 'দেবদাসী' গল্পে দেবদাসীর জীবনের চরম যন্ত্রণা, দুঃখ-দুর্দশা ও হিন্দুসমাজের পূজারীর নিষ্করুণ নির্যাতনের ছবি অংকিত করেছেন অনুরূপা দেবী। দেবদাসী বিশোকা সামাজিক অত্যাচারের সম্মুখীন হওয়ায় বুঝতে পারে—

> *"সে দেবতা নহে, মানবেরও নহে, শুধু দেবনামে*
> *উৎসর্গিতা মানবের ক্রীড়াদাসী মাত্র।"*[৫]

বিশোকা শেষপর্যন্ত মৃত্যুকে বেছে নিয়েই এই কুৎসিত অবস্থান থেকে নিজেকে মুক্ত করে। 'পরাজয়' ও 'দেবদাসী' গল্প দুটিতে অনুরূপা দেবী নারীর ওপর সামাজিক শোষণ ও নির্যাতনের ছবি যেমন দেখিয়েছেন তেমনি নারীর ব্যক্তিসত্তারও জয়-জয়কার করেছেন। 'উড়ো চিঠি' গল্পে তা বিশেষ করে নজরে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর কলহে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই এই ভেবে যোগেন মল্লিকের স্ত্রীর ওপর অত্যাচার হলেও প্রতিবাদ করেনি পাড়া-প্রতিবেশিরা। অমিয়া তা সহ্য করতে না পেরে অত্যাচারের প্রতিরোধের কথা তার বাবাকে বলায় ইন্দ্রনাথের মুখে যখন শুনতে পায়,

"ওর বউকে ও মারবে— তোমার মা-মাসীকে ত আর মারতে আসেনি যে, আমি তার বাড়ী চড়াও হয়ে আপত্তি করতে যাবো?"[৬]

তখন অমিয়ার হিতাকাঙক্ষী মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। সে বলে ওঠে—

"তার স্ত্রী বলে সে কি মানুষ নয়। বিপন্নকে রক্ষা করাতো সকল মানুষেরই কর্ত্তব্য।"[৭]

অমিয়ার মধ্যে পরিদৃষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আকাঙক্ষা। ইন্দ্রনাথ যখন বললেন স্বামী খেতেও দিতে পারে আবার মারতেও পারে। তখন ক্রুদ্ধ অমিয়ার কণ্ঠে শোনা যায় প্রতিবাদী স্বর—

"এর নাম আদর্শ স্ত্রীত্ব? মাতাল স্বামী মারিয়া হাড় ভাঙিয়া দিলেও পাড়া-প্রতিবেশী বাধা দিবার অধিকার নাই; স্ত্রীরও এমন ক্ষমতা নাই যে, এই অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচে? দাসত্ব প্রথা এর চেয়ে বেশি কি কঠোর ছিল?"[৮]

অনুরূপার নির্মিত নারীরা আদর্শ নারী অন্যদিকে ত্যাগ ও হিতৈষী মনোভাবনার অধিকারিণী। আবার তাঁরা সমাজব্যবস্থাকেও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেও পারে। অনুরূপার আরেকটি অন্যতম গল্প 'ত্যাগের দিন' গল্পটিতে দেখা যায় জাপানী মেয়ে মিনামি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ অন্যদিকে ভাইয়ের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। গল্পটি ১৯০৫ এর রুশ জাপান যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। যুদ্ধে ভাইয়ের মৃত্যুতে মিনামী সঙ্গীহীন হয়ে ওঠে। ভাইয়ের মৃত্যুর দুঃখকে সংবরণ করে সে পরিচালনা করে স্বদেশের বিজয় মিছিল। মিছিলের পরিশেষে

দেখা যায়, চাপিয়ে রাখা দুঃখকে আটকে না রেখে সে জোরে-জোরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। অনুরূপার লেখনীতে ওঠে আসে নারীর চারিত্রিক গুণাবলী। অনুরূপা লেখেন—

> *"... রমণী সত্যিই রমণী! স্নেহে, প্রেমে, ত্যাগে সকল*
> *দেশেই নারী প্রকৃতি এক— নারী কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি!*
> *ত্যাগের জীবন্ত ছবি।"*[৯]

অনুরূপা দেবীর সমসাময়িক লেখিকা নিরুপমা দেবীর কলমেও ওঠে এসেছে নারীর জীবনকাহিনি। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের জীবনচর্যায় যে বৈষম্যের রেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল নিরুপমা দেবীও তাঁর ব্যক্তিজীবনে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

নিরুপমা ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী হিন্দু পরিবারের চিন্তাধারায় প্রতিপালিত হয়েছেন। ফলে তাঁর পক্ষে সমাজের নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নিরুপমার চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আসে। ফলে নিরুপমার লেখনীর বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গিতে এসেছে অসাধারণ পরিবর্তন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে নারীদের সংস্কারের নামে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ পরিবেশে অত্যন্ত কষ্টে জীবনযাপন করতে হত, নারীর এই মনোকষ্ট নিরুপমা গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিশেষ করে নারীদেরই জীবনকাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। অনুরূপার মতো নিরুপমার নারী চরিত্ররাও কর্তব্যপালনে সচেতন, প্রেম, ক্ষমা ও ত্যাগের জীবন্ত মূর্তি। চরিত্রের দিক থেকে অটল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় অবিচারকে তাঁরা মেনে নেন না। 'প্রত্যাখ্যান' গল্পে তেমনি এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর অসাধারণ জীবন গাঁথা লিখেছেন নিরুপমা দেবী। আলোচ্য গল্পে কল্যাণী বুঝতে পারে

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে নারী শুধু সন্তান উৎপাদনের কারখানা মাত্র। বংশরক্ষার জন্য জন্মদাত্রী মা থেকে সন্তানকে পৃথক করে দেওয়া যে বড় অন্যায়, সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায় কল্যাণী। স্বামীর সঙ্গে পুত্রকেও প্রত্যাখান করে। কল্যাণীর মতো তেমনি এক ব্যক্তিত্বময়ী কল্যাণীয়া রমণী ইন্দুমতীকে দেখিয়েছেন নিরুপমা 'ব্রতভঙ্গ' গল্পে। নারী চাইলে সংসারকে ধ্বংস করতে পারে আবার নারীরই সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায় সংসার রমণীয় হতে পারে। কথাতেই আছে—

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'

ইন্দুমতী চরিত্র উপরোক্ত কথাকে প্রমাণ করে। ইন্দুমতী চাইলে ভাইয়ের বন্ধু জমিদার অতুলকে বিয়ে করে তার বৈধব্য দূর করতে পারত। কিন্তু ইন্দুমতী তা করেনি কারণ অতুল অন্যের স্বামী। এখানে এক কল্যাণীয়া রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। যার সঠিক সিদ্ধান্তে কমলার সংসার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

অন্যের সমালোচনা না করে যে আত্মসমালোচনা করতে পারে সেই ব্যক্তিই যথার্থ মানুষ। নিরুপমার নারীচরিত্রে তেমনি গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রত্যার্পণ' গল্পে দেখা যায়, নীহার অরুণকে জোর করে বিয়ে করে কমলার প্রতি সে যে অন্যায় করেছে তা বুঝতে পারে। কমলা জমিদার রাধাকান্তের একমাত্র কন্যা অরুণের প্রথমা স্ত্রী। জমিদার রাধাকান্ত অরুণকে ঘরজামাই হিসেবে রাখার জন্য তাকে প্রতিপালন করেছিলেন। অরুণ নীহারকে বিয়ে করলেও নীহার ধীরে-ধীরে বুঝতে পারে অরুণের ভালোবাসা সে পায়নি। মৃত্যুর আগে কমলাকে বলে যায়—

> *"দিদি, জোর করে কি কেউ কারুর বিধিদত্ত সম্পদ*
> *কেড়ে নিতে পারে?"*[১০]

লিঙ্গ-পরিচয়কে অমান্য করে যাঁরা মেয়েদের জীবনের প্রত্যেক পর্যায়কে পর্যবেক্ষণ করেছেন নিখুঁতভাবে, সন্ধানী মনোভাব নিয়ে জগতের নানা অনাবিষ্কৃত দিকে আলো নিক্ষেপ করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন নারীমুক্তিবাদী লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী। তাঁর লেখনীতে নারী ও নারীজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। যিনি শুধু বাংলাদেশের নয়, বাংলার বাইরেরও মেয়েদের 'দিনযাপন' ও 'জীবনধারণ' এর শোচনীয় অবস্থানকে দেখিয়েছেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন—

"জীবনের পথে মেয়েদের পাথেয় আমাদের সমাজে
কখনোই কেউ পায় না।"

জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবনের বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়েছে রাজস্থানের মাটিতে। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় রাজস্থানে নারীদের বিক্রি করে দেওয়া, শিশুকন্যাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা, তাছাড়াও বাংলায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সতীদাহ প্রথা, দেশভাগে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে মা চিনেও না চেনার ভান করা, পণপ্রথা, বিধবাদের প্রতি অবিচার, সাংসারিক জীবনে নারীর প্রতি বঞ্চনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে উপজীব্য করে জ্যোতির্ময়ী নারী জীবনের বিবিধ দিক তুলে ধরেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থায় কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানই অভিপ্রেত। 'বেটী কা বাপ' গল্পে জ্যোতির্ময়ী সমাজের এই ঘৃণিত মানসিকতাকে উপস্থাপন করেছেন এবং সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন সমাজে পুত্রের তুলনায় মেয়েদের ভিন্ন চোখে দেখা হয়। দেখা যায় ষষ্ঠ কন্যা পদ্মিনী কন্যা বলেই পিতামহীর হাতে বেশী করে আফিং খেয়ে প্রাণ হারাতে হয়। 'আরাবল্লী আড়ালে' গল্পে কিছু টাকার বিনিময়ে ধাপি ও মনফুলীর বাবা তাদের কন্যা ধাপি ও মনফুলীকে বিক্রি করে দেয়। তাদের মধ্যে না দেখা যায় কন্যা থেকে দূরে হয়ে যাওয়ার দুঃখ, না অনুশোচনা। উল্টে মনফুল্লীর বাবার মুখে শোনা যায়—

"বেচব কেন? এতদিন মানুষ করিনি? তার তো খরচ লেগেছে! হুজুর সাহেব অমনি অমনি নেবেন কেন?"[১১]

উল্লেখ্য যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখনীতেও প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবন। পুরুষদের কাছে নির্যাতিত, অবমানিত নারীর এই দৈন্যদশাকে নিপুণ হস্তে তুলে ধরেছেন শৈলবালা তাঁর রচনায়। মা-সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ঈশ্বরের সৃষ্ট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ। স্বামী-স্ত্রী একে-অন্যের পরিপূরক। কিন্তু কখনও দেখা যায় স্বার্থন্বেষী পুরুষরা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে স্ত্রীকে ব্যবহার করেন বিভিন্নভাবে। স্ত্রীর ওপর কখনও আপন প্রতিপত্তি বজায় রাখার ইচ্ছায় করে চলে নৃশংস অত্যাচার। যে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে পারে তৎকালীন সমাজে সেই-ই আদর্শ গৃহিণীর শিরোপার অধিকারিণী। 'জামাইবাবু' গল্পে পুরুষের প্রভুত্ব পরায়ণতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা লক্ষ্য করা যায় শৈলবালার। 'জামাইবাবু' গল্পে জামাইবাবুর কথার মধ্যে পিতৃতন্ত্রের দম্ভ উদ্ভটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সব সময় মেয়েদের এমন কথা শুনতে হয়। যেমন—

"শক্ত শাসনে না থাকলে মেয়েমানুষ কখনো নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, স্বাধীনতার দাবি করবার অধিকার মানুষের আছে বটে কিন্তু মেয়েমানুষ যে আলাদা জাত।" [১২]

আবার দেখা যায় লেখিকা পুরুষের মুখেই শোনালেন নারী সমর্থনের কথা—

"এ সমাজে কুক্কুরী, শূকরীদের সম্মান আছে, কিন্তু সিংহবাহিনীদের সম্মান নাই। আপনাদের অবস্থার

পক্ষে এইটেই ন্যায্য প্রাপ্তি বলে মনে করুন। ...
বলুন ওদের, ওরে চিরলাঞ্ছিত, চির প্রতারিতের দল,
তোরা মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের কথাকে ভয় করবি
ততোই বেঁড়ে উঠবে।"[১৩]

লেখিকার কাছে পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্র বিরোধিতার বিষয়, তিনি জানেন হাতের পাঁচ আঙ্গুল যেমন সমান হয় না, তেমনি পুরুষমাত্রেই সব খারাপ নয়। শৈলবালার অভিমত নারীমুক্তির একমাত্র সোপান শিক্ষা।

নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলতেন—

"এদের দুষ্ট গ্রহ শান্তির প্রথম স্বস্ত্যয়ন— নিজের
পায়ে ভর দিয়ে স্বাবলম্বী মানুষ হয়ে দাঁড়ানো।"[১৪]

সমাজে প্রান্তিকায়িত অপরসত্তা হিসেবে আখ্যায়িত নারীকে গতানুগতিক চক্রব্যুহের মধ্য থেকে মুক্তিদানে আশালতা সিংহের রচনা বাংলা সাহিত্য পরিমণ্ডলে বিশেষ প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যবহ। পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারীচরিত্র চিত্রণে আশালতা প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় অন্তঃপুরের কঠোর নিয়মনীতির বন্ধনে আবদ্ধ নারীরা সমাজে অবহেলিত, আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত, সেই প্রেক্ষাপটে আশালতার ছোটগল্পে নারীদেরও যে ইচ্ছা, আকাঙক্ষা, ভালোলাগা— না লাগা আছে। বলা যেতে পারে 'নারী জীবনেরও যে মূল্য আছে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত'। সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি ও বাস্তবজীবন— বিশ্লেষণী ক্ষমতার সংমিশ্রণে নির্মিত আশালতার প্রতিটি নারীচরিত্র। তাঁর নারীরা শিক্ষিত, সাহিত্য ও সংগীতে অভিজ্ঞ, ব্যক্তিত্বময়ী, যুক্তিবাদী, আপন মহিমায় ভাস্বর। তৎকালীন লেখিকাদের কলমে 'নারীর সংকট' ও 'যন্ত্রণাদগ্ধ' নারীর করুণ কাহিনী যেমন লিপিবদ্ধ তেমনি আশালতার নিপুণহস্তে নারীর বিভিন্নরূপ ও নারীজীবনের বিভিন্ন দিকও উদ্ভাসিত। সমাজে যেখানে নারীর ভূমিকা শুধুই

ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেই পটভূমিতে আশালতা সময় ও সমাজের থেকে এগিয়ে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ স্থান বা মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। আশালতার লেখার ব্যতিক্রমী স্টাইলের জন্য বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা তাঁর প্রশংসা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু দিলীপকুমারের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—

> *"আশালতার লেখার আমি খুব ভক্ত, ... এন্তার রাবিশের মধ্যে আশালতার লেখা সেই বিরল দু'একটির মধ্যে স্থান পায় যা পড়বার যোগ্য। আপনার মতন আমারও বিশ্বাস উনি হচ্ছেন বাংলাদেশের একমাত্র মেয়ে— অন্তত লেখায় যাঁদের পরিচয় পাই— যিনি বুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ।"* [১৫]

আশালতার সৃষ্ট নারীবিশ্ব মোটামুটিভাবে এরকম—

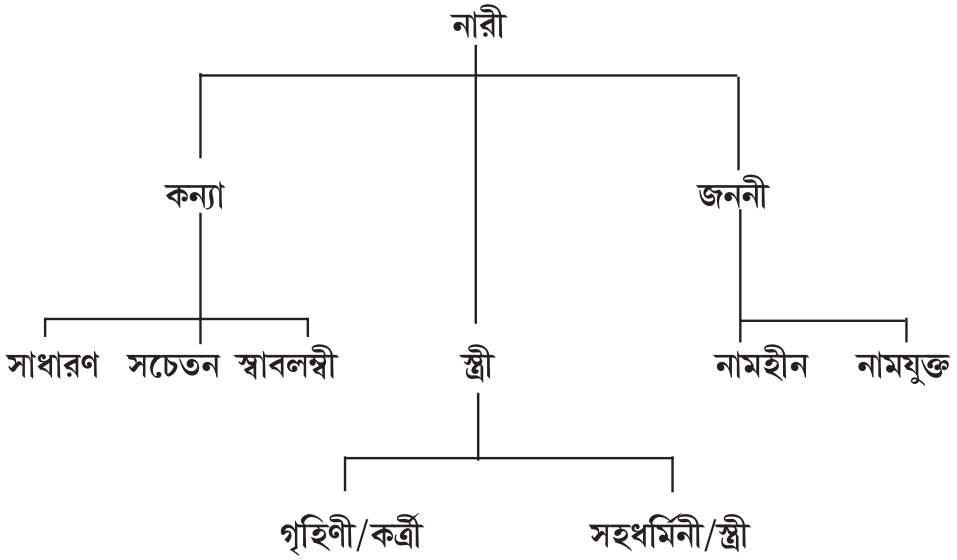

আশালতা নারীজীবনের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম দিক যেমন বিবৃত করেছেন তেমনি তার সত্তাকে, তার স্বরকে, তার ভাবনা-উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পবিশ্বে। নারীর পরিচয় কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে। কন্যা পিতা-মাতার অত্যন্ত আদরে

লালিত। তবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কন্যা সন্তান ছিল মূল্যহীন। অধিকাংশ সময়, তাদেরকে অনিচ্ছায় অনেক কাজ করতে হত। তবে আশালতার নারীদের কিন্তু এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি, তাঁদের শিক্ষার, নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার এমনকি স্বতন্ত্র বিচরণের অধিকার ছিল। সময় ও সমাজ থেকে তারা অনেকটাই প্রাগ্রসর। পুরুষের প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই নারীজীবনের সফলতা বলে মনে হয়নি তার। আশালতার সৃষ্ট নায়িকারা সমাজশাসনকে অস্বীকার করে নির্বাচন করে তাদের প্রণয়ী। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারিণী আশালতা এড়িয়ে যেতে পারেননি নারীজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাবেগ ও অনুভূতি। নারী মনে যে লুক্কায়িত রহস্যময়তা ও অনুচ্চারিত ভাবনার দিকগুলি বিদ্যমান আশালতা অত্যন্ত সহজ সরলভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর 'নারীচরিত্র' গল্পের মাধবী চরিত্র চিত্রায়ণে। আশালতা সিংহের প্রথম খণ্ডের অগ্রন্থিত গল্পগুলির মধ্যে একটি হল 'নারীচরিত্র'। গল্পটি 'উদয়ন' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪১এ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে আশালতা মাধুবী নামে এমন একজন সাধারণ নারীর জীবনকাহিনিকে তুলে ধরেছেন যে নিজের বিয়ের কথা ভাবে না। তাঁর জীবনে একমাত্র সংকল্প বৃদ্ধ অসুস্থ পিতার সেবা আর বোনকে মানুষ করে সৎপাত্রে বিয়ে দেওয়া। তাই সে একদিন বান্ধবী ইন্দিরার দেবর শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু একসময় দেখা যায় সে তাঁর থেকে অনুপযুক্ত বৃদ্ধ ম্যজিস্ট্রেটকে ভালোবেসে ফেলে। সেই বলে—

> *"আমার জীবনে কোনদিন যে এমন আবির্ভাব ঘটবে তা কে ভেবেছিল? আমার মত একজন সামান্য মেয়ে, প্রতিদিনের শত সহস্র তুচ্ছতায় যার দিন কেটে যাচ্ছিল, সেও যে এমন করে ভালোবাসতে পারবে, তা কি আমি কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেছিলুম।"*[১৬]

কিন্তু সে তার দায়িত্ব থেকে সরে যায়নি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটির জীবনে মাধবী ঘোরাফেরার সঙ্গী মাত্র ছিল। তাই তো ম্যাজিস্ট্রেট মাধবীকে ছেড়ে কটকে বদলি হয়ে যায়। আশালতা দেখিয়েছেন নারীরা কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পেলে তাঁর সমস্ত জীবন তার পায়ে লুটিয়ে দিতে পারে। তাই ইন্দিরার স্বামী মহিমের মাধ্যমে শোনালেন নারীচরিত্রের পরিণামের কথা—

> *"কি করে যে মেয়েরা অযোগ্যের পায়ে একান্ত নিষ্ঠার সহিত নিজেকে লুটিয়ে দেয়, কেমন করে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙক্ষায় বঞ্চিত বিধবা তার অনাদৃত জীবন, যৌবন একটি মাত্র বিগ্রহের চরণে নিঃশেষ করে নিবেদন করে— সে কথার আমি কী জানি যে, এর উত্তর খুঁজে পাব— সেই যে একটা কথা আছে— নারীচরিত্র স্বয়ং বিধাতারও অজ্ঞাত, বোধ করি সেই কথাটাই ঠিক।"* [১৭]

'সেলায়ের কল' গল্পটিতে আশালতা হরকুমার ও সুরবালার সুখী দাম্পত্যজীবনের ছবি যেমন এঁকেছেন সেই সঙ্গে শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদ মুখর নারীচরিত্রের অবতারণাও করেছেন। 'সেলায়ের কল' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ এ প্রকাশিত হয়। এই গল্পে সিঙ্গার কোম্পানিতে কর্মরত অনিমাকে তার অবমাননার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দেখা যায়। সিঙ্গার কোম্পানিতে কর্মরত অনিমা বাঁকুড়ায় বদলি হয়ে আসা হরকুমারের স্ত্রী সুরবালাকে সেলাই শেখানোর কর্মে নিযুক্ত হয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর বাড়ি এসে কালবৈশাখী ঝড়ে বৃষ্টি ভেজা বিছানা সংস্কার, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে তার বিরক্তিসূচক মন্তব্য শুনে নিতাই বলে—

> *"দুপয়সার উপার্জ্জন করতে শিখলেই মেয়েদের এমন*

বাড় হয় বটে।" [১৮]

নিতাই-এর সঙ্গে অনিমা একই বাড়িতে থাকে। নিতাই ও অনিমার সম্পর্ক সমাজের চোখে অবৈধ। অনিমার রোজগারেই নিতাই বেঁচে আছে। দেখা যায় নিতাই অনিমাকে সুরবালাদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার অজুহাতে প্রায়ই তাদের বাড়িতে চা খেতে ও সুরবালাকে দেখার উদ্দেশ্যে আসে। নিতাইয়ের কামনার চোখে সুরবালাকে দেখার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ তাদের বাড়িতে আগমনে লজ্জায় অনিমা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়ে পড়ে। নিতাই অনিমার চাকরি ছাড়ার কথা শুনতে পেয়ে আক্রোশে অনিমাকে প্রশ্ন করে। বলিষ্ঠ কণ্ঠে জবাব দেয় অনিমা—

> *"স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনের দিব্যদিনের পর দিন কেমন করে আরামে আছ, আমি যখন ভাবি, তখন অবাক হয়ে যাই। কিন্তু টাকার কথা বাদে ওখান থেকে বিদায় নিতে আমার নিজেরই কি কম কষ্ট হয়েচে। কিন্তু অমন কাজটাও শেষে তোমার জন্য ছেড়ে দিতে হলো।"* [১৯]

অথচ অনিমার অর্ন্তলোকের ভাবনা ছিল—

> *"আমার হৃদয় প্রাণ সকলই*
> *করেছি দান*
> *কেবল শরমখানি রেখেছি।"*
>
> *—রবীন্দ্রনাথ*

কিন্তু নিতাইয়ের নির্লজ্জ আচরণ তাকে আহত করে, প্রতিবাদে সে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আশালতার প্রথম খণ্ডের অগ্রন্থিত আর একটি গল্প হল

'সুখবাদ'। গল্পটি প্রকাশিত হয় 'উত্তরা' পত্রিকায়, কার্তিক ১৩৪০ সালে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারী দীপ্তি। নিজের সম্পর্কে সচেতন, নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত। নিজের প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখতে ভালোলাগে তার। সে সকলের চেয়ে পৃথক। বন্ধু মানসীদের বাড়িতে সাহিত্য সভায় জিতেনবাবুর মতো সাহিত্যিককে সে বলেছে—

> *"আপনি একটি চমৎকার ছোটগল্প লিখে যে আনন্দ পান আমি বিকেলে গা ধুয়ে যখন আমার নরম রেশমের মত ধবধবে সাদা শাড়ি খানি পরি, পরে সূর্য্যাস্তের সোনালি আলোর সামনে এসে দাঁড়াই তখন ঠিক সেই রকমই আনন্দ পাই।"*[২০]

দীপ্তি সাজে নিজের জন্য, পুরুষের পায়ে লুটিয়ে পড়ার জন্য নয়। তাই তো—

> *"সুন্দর হয়েও সে নিজেকে কারো পায়ে লুটিয়ে দিতে পারছে না।"*

'সুখবাদ', 'নারীচরিত্র' ও 'সেলায়ের কল' এই তিনটি গল্পে তিন ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন নারীজীবনের ছবি অংকন করেছেন আশালতা। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজগুণে সামান্য থেকে অসামান্যতায় পৌঁছে আমাদের মনোলোকে লুক্কায়িত সহৃদয়তার স্রোতে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।

নারীরা শৈশব থেকে বিবাহ পূর্ব পর্যন্ত পিতৃগৃহে বসবাস করে। সেখানেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয় এবং যখন বৈবাহিক বন্ধনে যুক্ত হওয়ার সময় আসে তখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে যেতে হবে ভেবে তারা দুঃখিত হয়ে পড়ে। আশালতা স্ত্রী বা গৃহিণীর চিহ্নায়ক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে

নারীজীবনের আরেক পর্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর গল্পবিশ্বে। আশালতার নারীরা সেকালের তুলনায় প্রাগ্রসর। তাদের জীবন অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা শিক্ষিতা, পুরুষদের সম্মুখে বের হয়, তাদের সঙ্গে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজবিষয়ক আলোচনা করে। পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে যেতে দেখা যায়। তারা স্বাধীন কিন্তু স্বেচ্ছাচারি নয়। সংযত আচরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। 'সুরমার সংযম' গল্পে সুরমা ধনী পরিবারের বধূ। সে বন্ধু স্থানীয় হরলালকে নিয়ে বেড়াতে যায়। চিত্রায় সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরে হরলাল যখন জলপান করার উদ্দেশ্য করে সুরমার বাড়ির অন্তঃপুরে গিয়ে পুনরায় কথাবার্তা বলতে থাকে তখন অধিক রাত্রি হয়ে গেলে গাড়ি পাবে না একথা বললে সুরমাকে হরলাল বললেন—

> *"তোমার ভিতর ও বাহির দুয়েই স্বাধীনতাও অগাধ। নাই বা বাস পেলুম। না হয় তোমার স্বামী যে মটরে ফিরে আসবেন তাতেই বাড়ী যাব।"*[২১]

হরলালের কথার পরিপ্রেক্ষিতে সুরমা বলেন—

> *"আমি যে পুরোপুরি স্বাধীন সেইজন্যই যে আমাকে বেশী করে সংযমের বন্ধন মেনে চলতে হয়। শুধু রাত এগারোটা কেন, সারারাত্রি বসে তোমার সঙ্গে গল্প করলেও আমার স্বামী কিছুই মনে করবেন না— কিন্তু জিনিষটা সুন্দর নয় এবং সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অতএব এবার তুমি বাড়ী যেতে পার।"*[২২]

সুরমা স্বাধীন হলেও যথেষ্ট সংযমী, নিজের আচরিত কর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও স্বেচ্ছাচারিতা তার কাম্য নয়। আশালতার সমসাময়িক লেখিকা আশাপূর্ণার কলমেও সেকালের 'দাম্পত্যসম্পর্ক—

নির্ভর— সংসারের' জটিল ছবি চিত্রিত। অন্তঃপুরের চারদেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদের জীবন। সব কিছুতেই তাদের অধিকারহীনতা। তাই আশাপূর্ণার মনে প্রশ্ন জেগেছিল—

"মেয়েদের সবকিছুতেই এমন অধিকারহীনতা কেন?
তাদের ওপর অন্যায় শাসনের জাঁতাচাপানো কেন?
তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন?"[২৩]

এসব 'কেন'র উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা আশালতারা তাদের প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে নারীর নিজস্ব ঘর হয়ে ওঠে শ্বশুরালয়। সংসার, স্বামীসেবা, সন্তানপালন, অতিথিসেবার নিরন্তর চাপে পেছনে ফেলে আসা পিতৃগৃহ, যেখানে শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত— তাকেই একসময় বিস্মৃতি গ্রাস করে ফেলে। 'ছয় বছর পর' গল্পের সুনীতি, স্বামীর চাকুরীতে ছুটি নেই বা ছেলেদের পড়াশুনায় ক্ষতি হবে ভেবে বছরের পর বছর পিত্রালয়ে আসেনি। আশালতার দৃষ্টি থেকে নারীজীবনের এদিকও বাদ পরেনি।

নারী তো স্নেহ, মমতা, ত্যাগের প্রতিমূর্তি। ঘৃণাকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে পারদর্শী। 'আন্তরিক আতিথেয়তার' মাধ্যমে পরকেও আপন করে নিতে পটীয়সী। তেমনি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আশালতার গল্পবিশ্বের নারীচরিত্রে। 'ভালোলাগা' গল্পের পরিসরে আশালতা দেখিয়েছেন শহরাঞ্চলে প্রতিপালিত ছায়া গ্রামাঞ্চল নিয়ে ভ্রান্তিমূলক ধারণায় পরিবর্তন আসে সবিতার আচরণে। শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের পর সবিতার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। সে সময় ছায়া তাকে কাজ করতে নিষেধ করলে সবিতা জানায়, শাশুড়ি সংসারের ভার তার উপরেই ন্যস্ত করে গেছেন। যথাযথভাবে তা পালন করতে পারবে কিনা, এই ভেবে তার ভয় হয়। ছায়া সবিতার কথা শুনে ভাবতে থাকে সবিতা কিভাবে পরের মাকে, পরের পরিবারকে এমন আপন করে নিতে পারে। সবিতার এই নিঃস্বার্থ

সেবাপরায়ণতা ছায়াকে প্রাণিত করে। যেখানে সে একদিনও থাকতে পারবে না ভেবেছিল, সেখানে সে আরও কিছুদিন থাকতে চায়। আশালতার কুশলীটানে প্রেম-ভালোবাসার সৌহার্দ্য বিজয়গাঁথা রূপায়িত হয়েছে 'ভালোলাগা' গল্পে। আশালতার তেমনি আরেকটি গল্প হল 'অন্তর্যামী' নামে গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অপমান' গল্পটি। আভা ও পুষ্প এ দুটি নারীচরিত্র অবতারণা করেছেন আশালতা আলোচ্য গল্পে। আভা ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সে পড়াশুনা, গানবাজনা এবং কাব্যচর্চা করে সময় অতিবাহিত করে। তাঁর দাদার বন্ধু দীপেশের সঙ্গে তার প্রণয়-সম্পর্ক। অন্যদিকে পুষ্প বাল্যকালে মাতৃহীনা। বৃদ্ধরোগগ্রস্ত পিতার সেবা, ঘরের কাজকর্ম ও স্কুলের চাকরি এসবের মধ্য দিয়ে তার দিন নির্বাহ হয়। আভার বাড়িতে দীপেশ নিমন্ত্রিত হলে আভা পুষ্পের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে দীপেশকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে পুষ্পের আনাড়ি হাতের বেহালা বাদন শুনতে পেয়ে দীপেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে দীপেশ যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক মন্তব্য করেছিল তখন পুষ্প বাড়ির দরজা থেকে তাদের কথা শুনতে পেয়ে দুঃখিত হয়। এদিকে কিছুদিন পর দীপেশ ও আভার প্রণয় সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্কে পরিণত হয়। বিয়ের পর কলকাতায় এসে দীপেশ ঘরকুনো, শান্তিপ্রিয়, কাব্যরসিক মানুষ হয়ে ওঠে অন্যদিকে আভার মধ্যে দেখা যায় সংসারের প্রতি অমনোযোগিতা। একদিন বন্ধু অপূর্বের অনুরোধে দীপেশ তার বাড়িতে যায়। এবং জানতে পারে পুষ্প হচ্ছে তার বৌদি। পুষ্প অপূর্ব ও দীপেশকে নিজের হাতে আদরযত্ন সহকারে অন্ন পরিবেশন করে। প্রত্যেক মানুষই তার সহধর্ম্মিনীকে 'গৃহিণী', 'মিত্র', 'সহমর্মিণী' রূপে পেতে চায় তাই দীপেশ আভাকে তার জীবনের যথার্থ সঙ্গিনীরূপে বেছে নিয়েছিল। শ্বশুরালয়ে পুষ্পের সেবাপরায়ণতা, কর্তব্য-নিষ্ঠা তাকে নতুন করে ভাবায়। সে বুঝতে পারে পুষ্পের মধ্যেই নারীর পরিপূর্ণরূপ বিরাজমান। সে স্নেহ, ভালোবাসা সেবার সাহায্যে অজানা, অপরিচিত শ্বশুরালয়কে আপন করে নিয়েছে। তার

এই কল্যাণময়ী রূপ দেখে দীপেশ অভিভূত।

"বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ
আপন গৃহ কাজে।"

— রবীন্দ্রনাথ

এ গল্পে আভা ও পুষ্প চরিত্র দুটির মাধ্যমে নারীর গৃহিণীরূপের প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরেছেন আশালতা। 'সাধনার ফল' গল্পে আশালতা নারীর রমণীয় রূপকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪৮ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় রেবা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, ছাত্রী নমিতাকে ভালো ফলাফল হওয়ায় শুভেচ্ছা জানাতে এসে নমিতার বাড়িতে একদিকে বিধবা পিসিমার কুসংস্কার ও চিৎকার তাঁকে বিরক্তি প্রদান করে অন্যদিকে নমিতার কাকা রমেনের মুখে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন কারণে সংঘাত থাকা সত্ত্বেও চিরকাল ধরে তাদের মধ্যে মিলনসাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা শুনতে পেরে রেবা মুগ্ধ হয়। পরবর্তীতে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর রমেন এক বছরের জন্য পড়তে যাওয়ার আগে সে রেবাকে কাকার বাড়িতে রেখে আসতে চায়। কিন্তু রেবা তার ইচ্ছার কথা জানায়, বলে এই বাড়িই তাঁর আসলবাড়ি। একথা শুনে রমেন বুঝতে পারে সে তার মনোমত জীবনসঙ্গীই পেয়েছে। গল্পটিতে আশালতা নারীর কল্যাণীরূপকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। যে শুধু স্বামীকেই নিজের মনে করে না, স্বামী পরিবারকেও আপন ভেবে নেয়। পরিবারের সকলকে আপন করে নেওয়ার এই গুণই নারীর শ্রেষ্ঠ গুণের মধ্যে অন্যতম। রেবা সেই গুণের অধিকারিণী বলেই স্বামী অবর্তমানেও শ্বশুরালয়ে থাকতে চায়।

শ্বশুরালয়ে নিরন্তর কর্তব্য ও দায়িত্বের টানাপোড়েন কখনও নারীর নিজস্ব ইচ্ছা-আকাঙক্ষার সমাপ্তি ঘটে। এরকমই দেখা যায় আশালতার 'বেদনার বিভিন্নতা' গল্পে। গল্পটি প্রথম গল্পসংকলনের 'লগন বয়ে যায়' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায়, ভাদ্র ১৩৪৬ এ প্রকাশিত হয়। 'বেদনার বিভিন্নতা' গল্পে দুই নারীজীবনের বৈচিত্র্যের ছবি বিবৃত। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন, নীলাভ আকাশ বিদ্যুৎ চমকানো ও বর্ষাদিনের তিমিরতা শর্ম্মিলার অন্তর ইন্দ্রিয়ে বেদনার সঞ্চার করে। উর্ম্মিলাকে জানালার পাশে বসে উর্ম্মিলাকে পত্র লিখে জানায়, বর্ষার এই দিনে তার রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ইচ্ছা করে। অন্যদিকে উর্ম্মিলা কলকাতার ছোট একতালা বাসায় দাম্পত্যজীবনের দায়িত্বের বোঝা ক্রমাগত বহন করে চলেছে। স্বামী উমাপদ যখন বান্ধবী শর্ম্মিলার চিঠি তার হাতে তুলে দেয় তখন উর্ম্মিলা কর্মব্যস্ততার জন্য চিঠিটি পড়তে পারেনি। পরবর্তী সময় চিঠিটি দেখতে পেয়ে পড়তে বসে তাঁর মুখমণ্ডলে হাসি ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেভাবে জীবনপথে একই বর্ষা ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির কাছে নিয়ে আসে ভিন্ন অনুভূতির অভিব্যক্তি। বর্ষার অপরূপ রূপে বিভোর হয়ে শেলী, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ পড়ছে শর্ম্মিলা আর অন্যদিকে উর্ম্মিলা সাংসারিক জীবনে যথারীতি নিরন্তর কর্মের মধ্য দিয়ে দিবারাত্রি অতিবাহিত করে চলছে। শর্ম্মিলা ও উর্ম্মিলা উভয়েরই মন, চিন্তাশক্তি ও 'সূক্ষ্মরসোপলব্ধি'তে সমর্থ। কিন্তু দাম্পত্যজীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্যের পালন এবং নিরন্তর কর্মব্যস্ততায় উর্ম্মিলার জীবন থেকে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে রোমাণ্টিক মনন ও কল্পনা প্রবণ চিন্তাশক্তি। আশালতা উর্ম্মিলার জীবনের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের চরমসত্যকে উত্থাপিত করেছেন।

পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীর ওপর স্বামীর আধিপত্য থাকে। স্বামী নিজের ইচ্ছা ও পছন্দকে চাপিয়ে দেয় স্ত্রীর ওপর। যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা ও পছন্দকে মেনে না নেয় তবে সেই স্ত্রীকে হতে হয় স্বামীর ক্রোধের শিকার। আশালতা 'স্বাধীনতা ও সম্মান' গল্পটিতে তেমনি এক বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

চারুশশী অশিক্ষিত কিন্তু পতিভক্তিপরায়ণা। সংসারের নিরন্তর কর্মব্যস্ততায় সন্তান পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর সারাদিন কেটে যায়। স্বামী হরিশ তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলেও তার বিপরীতে সে কোনো জবাব দেয় না। বহির্জগত তার কাছে অজানা। একদিন চারুশশী ইংরেজী শিক্ষিতা, আধুনিকা বৌদি চপলার সঙ্গে স্বামীর অজান্তে 'গ্রটাগার্বো সিনেমা' দেখতে যায়। হরিশের কাছে চারুশশীর এটা মস্ত বড় অপরাধ। বৌদি চপলার কাছ থেকে চারুশশীর ও তাঁর সিনেমা যাওয়ার কথা জানতে পেরে হরিশ চারুশশীকে অত্যন্ত অপমান করে। চারু ভেবে পায় না কেন হরিশ তার উপর রাগ করে আছে কারণ সেই চারুকে সবসময় বলত তুমি বৌদির মতো হতে পারো না। আসলে হরিশ চায় না, তার সতীলক্ষ্মী গৃহকর্ম নিপুণা চারুশশী বৌদি চপলার সঙ্গ পেয়ে তার মতো স্বাধীন, স্বতন্ত্র হয়ে ওঠুক অথচ হরিশের এমন কোনো দিন নেই যেদিন সে চপলার বাড়ির সান্ধ্য আসরে যোগদান করেনি। আশালতা এখানে এক ধরনের পুরুষদের মানসিকতাকে দেখিয়েছেন। আধুনিকা চপলা পুরুষসঙ্গীদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায়, পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করে ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের নিয়ে, তাঁর বহু পুরুষসঙ্গীও রয়েছে। পুরুষদের কাছে এমন মেয়ে আনন্দ দান করতে পারে। কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না, এ প্রসঙ্গে হরিশের মনে হয়েছে—

> *"এই রান্নাঘরের যুগের যে মেয়ে চারু তাকেই সে নিশ্চিত নিরাপদে বিশ্বাস করতে পারে, তারই উপর করতে পারে নির্ভর, তাকেই দিতে পারে সম্মান, তাকে নিয়ে জীবনে আনন্দ নেই কিন্তু আনন্দহীন সম্মান তার প্রাপ্য। রান্নাঘরের যুগ থেকে সে ঈষন্মাত্র নব পর্য্যায়ে উঠতে গেলেই হরিশের মনে তুমুল বিপর্য্যয় উপস্থিত হবে। যার প্রমাণ এইমাত্র সে হাতে হাতে পেলে। না, না তাই ভালো চারুর জীবনে*

স্বাধীনতা না থাকে সে'ত সম্মান পেয়েছে। সতীলক্ষ্মী
মার আসন এবং গৃহিণীর পদ তার।"[২৪]

প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের স্বধর্মরূপে নির্দেশিত 'স্বামীসেবা', যে নারী পুরুষের কথা মেনে চলে এবং পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীমুখর নয়, পুরুষশাসিত সমাজে সেই আদর্শ গৃহিণী। হরিশের মতো পুরুষরা চারুশশীর মতো মেয়েদের গৃহিণীরূপে পেতে চায়। 'দাম্পত্য সম্পর্ক নির্ভর সংসারে' নারীরা কিছু স্বার্থান্বেষী পুরুষদের হাতের পুতুল। পুরুষদের সেবা, মনোরঞ্জনের সাধনমাত্র। পুরুষের মতের অমত হলেই হতে হয় ক্রোধের শিকার। এ প্রসঙ্গে শৈলবালা ঘোষজায়ার 'জন্ম অপরাধী' উপন্যাসটি উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসটিতে দেখা যায় স্বামীর ক্রোধের ফলস্বরূপ পদাঘাতে মৃত্যু হয় অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর। বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন নারীদের জীবনচরিত যেমন আশালতার গল্পবিশ্বের মুখ্য উপজীব্য তেমনি নারীর মনের গহনে ডুব দিয়ে নারীর মনোলোকের গোপনতম রহস্যকেও উদ্‌ঘাটন করেন তিনি তাঁর বিভিন্ন গল্পে। যেমন— 'রূপান্তর', 'বিরহ', 'বিরহ ও মিলন' গল্পগুলিতে। স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শে নারীজীবনে যে অসাধারণ পরিবর্তন ঘটতে পারে 'রূপান্তর' গল্পের সুনীলা তার প্রোজ্জ্বল উদাহরন। নারী হৃদয় সবসময়ই স্নেহ ভালোবাসা ও সহানুভূতির আকাঙক্ষী। সুনীলার প্রতি বিনয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা সুনীলার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকেই পরিবর্তন ঘটায়।

'বিরহ' গল্পটি আশালতা সিংহের অগ্রন্থিত গল্পভাণ্ডারে এক অনন্য সংযোজন। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই বিরহকে কেন্দ্র করে গ্রন্থিত হয়েছে অসংখ্য অসাধারণ পদ্যমালা। প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদজনিত স্মৃতি রোমন্থিত মানসিক পীড়নই বিরহ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে 'বিরহ' প্রবাস বা মাথুর নামে অভিহিত। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বিরহ বা প্রবাসের সংজ্ঞা এরকম—

"পূর্বসঙ্গত য়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরা দিভিং।
ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈ স প্রবাস ইতীর্যতে।।"

অর্থাৎ পূর্বে সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে দেশান্তরাদির যে ব্যবধান তাকেই প্রাজ্ঞগণ প্রবাস নামে অভিহিত করে থাকেন। আশালতা 'বিরহ' গল্পে সুজিত ও মণিমালার বিরহের ছবি এঁকেছেন অন্যদিকে নারীর অপ্রত্যক্ষ মানসিকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। আষাঢ়ের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় সুজিত ও তাঁর বন্ধুদের আড্ডার বিষয়রূপে আসে প্রেম। এই প্রেমকেন্দ্রিক আলোচনায় শেষপর্যন্ত সুজিত বলে—

"বিরহ প্রেমের একমাত্র কষ্টিপাথর। এখানে যাচাই
না করে বলবার যো নেই ওর মধ্যে কতটা খাদ
রয়েছে তার কতটা আর আসল।"[২৫]

সুজিত নিজের জীবনেও প্রেমকে 'পরখ' করতে চায়, তাই লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে সিপির জন্যে পড়তে যেতে চায়। সুজিত এসব কথা মণিমালাকে শোনালে সে বলে সুজিত লণ্ডনে পড়তে যাওয়ার আগে সে দাদার সঙ্গে এলাহাবাদ দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনে যেতে চায়। মণিমালা এলাহাবাদে চলে যাওয়ায় বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতিতে অল্পদিনের মধ্যেই সুজিত একাকিত্ব অনুভব করতে লাগল। শেষপর্যন্ত বিরহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সুজিত এলাহাবাদে উপস্থিত হয়। সুজিতের লণ্ডন পড়তে যাওয়া প্রসঙ্গে এক সময় মণিমালা বলেছিল—

"আজকালকার মেয়ে, পুরুষের স্বপ্নে বাধা দিয়ে
হাতাবেড়ির ফাঁদে তাঁদের বাঁধতে চাইনে।"[২৬]

সুজিত এলাহাবাদে পৌঁছে মণিমালাকে একথাটি বদলে বলতে বলল—

"বদলিয়ে ব'ল যতই আধুনিকা হই বাঁধবার কামনা

আমাদের একতিলও কম নয়। আর যতই আধুনিক হও বাঁধা পড়বার লোভ তোমাদের একবিন্দুও কম নয়।"[২৭]

একথাটির সঙ্গে শুধু সুজিতের ভাবনা জড়িয়ে ছিল তা নয় মণিমালাও কথাটি স্বীকার করে। নারীরা যতই আধুনিক মননের অধিকারিণী হন না কেন স্বামীকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা তাদের কম নয়। তাঁরা ভালোবাসার বন্ধনকে শেকল মনে করেন না। এমনকি পুরুষের ক্ষেত্রেও তাই। আশালতার দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারেনি নারীর এই লুক্কায়িত মানসিকতা। এ প্রসঙ্গে এখানে মনে আসে দীনেশচন্দ্র সেনের একটি উক্তি—

"কোনো পুরুষ শত প্রতিভা বলেও রমণী হৃদয়ের গূঢ়কথার এমন আভাস দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।"[২৮]

'প্রতিক্রিয়া' গল্পে আশালতা নির্ম্মলার মধ্য দিয়ে নারীরা তাঁর না পাওয়ার বেদনা হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে কিভাবে হাসিমুখে অন্য সকলকে শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়। গল্পে দেখা যায় নির্ম্মলা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মহিলা। তিনি পত্রিকায় নারীর ধর্মকর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লেখেন। তিনি নারীজীবনের সার্থকতা দেখতে পান সমস্ত দুঃখকে বরণ করে নিয়ে নারীর গৃহকর্ম ও সংসারধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে। এই গল্পের আরেকজন নারী ইলাকে কেন্দ্র করে নির্ম্মলার অতীত প্রেমের স্মৃতি স্মরণ হয়।

এদিকে বিলেত ফেরত পিতা নরেনের সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। পিতা নির্ম্মলাকে বলেন—

"মা নির্ম্মলা মেয়েদের জীবনের চরমকথা ত্যাগে,

সুখভোগে নয়। তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ তুচ্ছ এখানে, জাতির সমাজের ভবিষ্যৎ জীবনধারা অদৃশ্য আকারে তোমার মধ্যে বইছে। তাকে নির্ম্মল করে প্রবাহিত রাখবার ভার তোমার উপরে। কোন লোভ কোন আপাত সুখের আকর্ষণে একথা ভুলো না। তোমার দায়িত্ব অনেক।" [২৯]

নির্ম্মলা সমাজের ও সকলের সুখের জন্য নরেনকে ত্যাগ করে আজীবন দুঃখের বোঝা বহন করে চলে। তরুণী বয়সের অপ্রাপ্তি মধ্যবয়সেও তাকে ক্ষণে-ক্ষণে পীড়িত করে।

নারীর দুটি প্রধান রূপ কন্যা ও স্ত্রী। নারীজীবনের পরিপূর্ণতা পরিণত মাতৃত্বে। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন গল্পকার-ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনায় মাতৃচরিত্র অংকন করেছেন। প্রথমদিকে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ টিপিক্যাল বাঙালি মাতৃমূর্তিরই অংকন করেছেন। বঙ্কিমের 'রজনী' উপন্যাসে 'লবঙ্গলতা' শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসে পার্বতী— তাঁদের সন্তানের প্রতি রয়েছে অপরিসীম ভালোবাসা, বিনিময়ে তাঁরাও সন্তানের কাছ থেকে পেয়েছেন অগাধ ভালোবাসা। এছাড়া মেয়েদের রচনাতে একই ধারা রয়েছে। অনুরূপা দেবীর 'মা' (১৯২০) উপন্যাসের ব্রজরাণী বা নিরুপমা দেবীর 'দিদি' (১৯১৫) উপন্যাসের সুরমা সপত্নী পুত্রদের আপন করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে আধুনিক বিভিন্ন গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও একই ধারা প্রবহমান। জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' (১৩৩৮) উপন্যাসে দেখা যায় টুকির সৎমা উত্তম ও টুকিকে নিজের সন্তানের মতো আপন করে নেয়। 'জাগরী' (১৯৪৬) উপন্যাসেও সতীনাথ ভাদুড়ী এক চিরপরিচিত মার ছবি এঁকেছেন। আগস্ট আন্দোলনে বন্দী বিলু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় তাঁকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখা যায় উপন্যাসে।

ভারতীয় ভাবধারায় 'মা' সম্পর্কে ধারণা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" কিন্তু বাস্তব জীবনের পথে 'মা' তেমনি মহিমান্বিত স্থানে বিরাজিত নন। পুরুষশাসিত সমাজে কিছু পুরুষদের ধারণা 'মা' শুধু সন্তান উৎপাদনের কারখানা মাত্র। 'সন্তান, স্বামী ও রান্নাঘর' আবার 'রান্নাঘর, স্বামী ও সন্তান' এই আবর্তের মধ্যেই মায়েদের জীবন নিশ্চল। পুরুষশাসিত সমাজে স্বার্থন্বেষী, সুবিধাভোগী কিছু পুরুষেরা মায়ের চিহ্নায়ক পরিচয়ের বাইরে ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। নিরুপমা দেবীর 'প্রত্যাখ্যান' গল্পে রয়েছে এমন এক মার জীবন কাহিনি। সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম ছাড়া সাংসারিক জীবনে যার কোন মর্যাদা নেই। সন্তান প্রসবের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও বাড়ির সকলেই পুত্র আগমনের আনন্দে মাতোয়ারা, তাঁর দিকে কেউ নজর রাখেনি। আশালতা নারীর প্রধান রূপ মার মধ্য দিয়ে নারীমননের আন্তরিক বিশ্লেষণ ও নারীর জীবন সমস্যাকে বর্ণিত করেছেন। 'মা' দুই শ্রেণীভুক্ত— (১) নামহীন মা (২) নামযুক্ত মা। আশালতার 'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মা' গল্পে দুই মায়েরই উল্লেখ রয়েছে। গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায়, ভাদ্র ১৩৪২ এ প্রকাশিত হয়। আশালতার 'মা' গল্পের মা নামহীন, সন্তোষের মা হিসেবে যার পরিচিতি। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে যখন সন্তোষ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে চা পান করার ইচ্ছা অরুণার কাছে প্রকাশ করলেও অরুণা চায় না সন্তোষ চা পান করুক। কারণ তার ধারণা চা পান করলে সন্তোষের শারীরিক ক্ষতি করতে পারে। মা ছেলের চা পানের ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়ে সন্তোষকে চাকরের মাধ্যমে ডেকে এনে চা পান করান। অন্তরালবর্তী এই মাকে আমরা চিনতেও পারি না বুঝতেও পারি না। তারা ভাবে অনুভবে, পলে অনুপলে মিশে থাকেন সন্তোষের মধ্যে। তেমনি এক 'মার' সঙ্গে পরিচয় ঘটে সুলেখা সান্যালের 'দেওয়াল পদ্ম' উপন্যাসেও। তাঁর নিজস্ব কোন নাম নেই। নিজস্ব কোন পরিচয় নেই, তাঁর একমাত্র পরিচয় সে সঞ্জয়ের মা, এই মা-ই ছেলের বৌয়ের ছিঁড়ে যাওয়া

সম্পর্কের ডোরকে জোড়া লাগাতে সচেষ্ট হন। আশালতা সিংহের 'মা' গল্পের অন্তর্বয়নে আধুনিক নারীর আত্মচিন্তা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মশুদ্ধি প্রভৃতি শিল্পরূপ পেয়েছে। 'মা' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য চিহ্নিত করতে গিয়ে আশালতা প্রাধান্য দিয়েছেন নারীচরিত্রের বিস্তৃত রহস্যে। গল্পে অরুণা মাতৃত্ব লাভের আগে তাঁর শাশুড়ীর মাতৃত্বের সঠিক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দিহান থাকে। সন্তোষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, স্নেহ সবকিছু অর্থহীন মনে হয় অরুণার কাছে। অরুণা মাতৃত্ব অর্জন করার পর বুঝতে পারে একজন মার কাছে তাঁর সন্তানের গুরুত্ব কতটুকু? তাই শাশুড়ীর মৃত্যুর পর একদিন সন্তোষকে বলে—

> *''তোমার সে কত লেগেছে তা বুঝতে পারি, আমি তো ভাবতেই পারিনে খোকার জীবনে এমন এক সময় আসবে তখন আমি থাকব না।''*[৩০]

গল্পের শেষদিকে লক্ষ্য করি অরুণার মানসিক চিন্তার পরিবর্তন এবং এর ইতিবাচক পরিণতি। শাশুড়ীকে অবহেলা ও অবমাননার স্মৃতি অরুণাকে বিচলিত করে তাই শেষপর্যন্ত অরুণা অনুধাবণ করেছে মায়ের প্রকৃত স্বরূপ। 'সুরমার সংযম' গল্পে সুরমার মাকে দেখতে পাই যিনি ধনী সম্ভ্রান্ত বাড়ির বউ। কিন্তু বিয়ের আগে দারিদ্র্যের ফলে নিজের জীবনে যা কিছু পেতে পারেননি তাই তার কন্যা সুরমাকে দিতে চান। সুরমা সেতার বাজানো শিখেছে, কীর্তন গাইতে পারে, ইংরেজি কথা বলতে পারে। যাতে ফ্রেঞ্চ জানতে পারে তাই ফ্রেঞ্চ শেখানোর শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়। সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসে তেমনি এক মার কথা জানা যায় যদিও তিনি আশালতার সুরমার মার মতো পল্লীগ্রামের মেয়ে নয়, তার নিজস্ব নাম থাকা সত্ত্বেও তার নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে যায়, চিহ্নায়ক পরিচয় বড় হয়ে ওঠে। পরিচিত হন কুসুমপুরের রায়বাড়ির বড় বউ পরিচয়ে। তিনি মেয়ের মধ্যে নিজেকে, তার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে,

ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কল্পনা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর অতৃপ্ত মন মেয়ে ছবির প্রাপ্তির মধ্যে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। তাই দেখা যায় ছবিকে বাইরে পাঠাতে, তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথে রায়বাড়ির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও দ্বিধান্বিত হননি। 'চিরভ্রান্তি' গল্পে আশালতা চিরপরিচিত মাতৃত্বের খোলসে দুই ঈর্ষান্বিত মাতৃচরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করান। আশালতা দেখিয়েছেন সন্তানের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা কখনও মাতৃহৃদয়ে ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত ভালোবাসার জন্য মা সন্তানের অধিকার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। চপলার প্রতিবেশী বউটি অসুস্থ হলে ডাক্তার ডেকে আনায় বিধবা মা মনে-মনে ঈর্ষা করে তাঁর পুত্রবধূকে। অন্যদিকে দেখা যায় চপলার মেয়ে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে পুতুল খেলাতে বেশী পছন্দ করে মার সঙ্গে থেকেও, এই বিষয় নিয়ে চপলা তাঁর স্বামীকে বাড়ি বদলের কথা বললে স্বামী হরকুমার তাঁকে জানায় সেও একই ভুল করতে বসেছে প্রতিবেশীর মত।

আশালতা কন্যা, স্ত্রী, জননী এই তিনটি রূপের মধ্য দিয়ে নারীর পারিবারিক তথা গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তব ছবি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে লেখিকা নারীর ব্যক্তিসত্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবাবেগ ও নারী মনের লুক্কায়িত রহস্যময়তাকেও আবিষ্কার করেছেন তাঁর গল্পের আলোকে। নারীকে শুধুমাত্র অন্দরমহলে আটকে না রেখে বৃহত্তর জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ব্যক্তিত্বময়ী আশালতা। প্রকৃতই আশালতার গল্পবিশ্ব মূলত নারী প্রাধান্যেরই জগত।

উল্লেখসূত্র :

১. অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন— প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৮৭

২. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'গৃহ' রোকেয়া রচনাবলী, কলকাতা ২০০১, পৃঃ ৫৯।

৩. অনুরূপা দেবী : সাহিত্য নারী— স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি— ভূমিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, জুন ১৯৪৯, পৃঃ ভূমিকা অংশ

৪. অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সম্পাদনা), অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবিলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০২, পৃঃ ২১।

৫. দ্র. ঐ, পৃঃ ১০৭

৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ৬৩

৭. দ্র. ঐ, পৃঃ ৬৩

৮. দ্র. ঐ, পৃঃ ৬৪

৯. দ্র. ঐ, পৃঃ ১২ (ভূমিকা অংশ)

১০. চিত্ররেখা গুপ্ত, নিরুপমা দেবী জীবন ও সাহিত্য, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ডিসেম্বর, ২০১১, পৃঃ ৮১

১১. গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পাদনা), জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭

১২. সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ— জানুয়ারি, ২০০০, পৃঃ ৩৪

১৩. দ্র. ঐ পৃঃ ৩৪

১৪. শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তি, কলকাতা, পৃঃ ১২১

১৫. দিলীপকুমার রায় : বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা ও প্রসঙ্গত : পুষ্পপাত্র, বৈশাখ ১৩৪০, পৃঃ ৬০।

১৬. অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহের গল্প সংলকন-১, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৬, পৃঃ ৪১৯।

১৭. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪২০

১৮. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪৪০

১৯. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪৪৩

২০. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৬৩

২১. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪১০

২২. দ্র., ঐ, পৃঃ ৪১০

২৩. আশাপূর্ণ দেবী, খেলা থেকে লেখা, আর এক আশাপূর্ণা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃঃ ১০

২৪. দ্র. ঐ, পৃঃ ১২৫

২৫. অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহের গল্প সংলকন-২, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭, পৃঃ ১৪০।

২৬. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন ১, পৃঃ ৫০৭

২৭. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন ১, পৃঃ ৫০৭

২৮. দীনেশচন্দ্র সেন, আমার জীবন, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, পৃ: ১০৪

২৯. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ২৬৮

৩০. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৫৪।